ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

ভাষা আন্দোলনঃ আত্মপরিচয়ের সন্ধান

মোঃ শরীফ হাছান *

Language Movement: Quest for Identity.

Md. Sharif Hasan

Abstract. Language Movement is a glorious event in our national history. It was our first organized protest against the Pakistani colonial rulers. The Pakistan rulers tried to impose Urdu as the only state language in Pakistan which covered only seven percent of the total population. On the other hand, Bangla was the mother tongue of fifty six percent people of the country. The Bangalees fought back and laid down their lives to uphold the dignity of their mother tongue. It was the first stage of our struggle against the Pakistani colonial rulers which ended with the nine-month long bloody war and Bangladesh emerged as an independent country on 16th December 1971. The emergence of Bangladesh owes a lot to the great Language Movement and it will remain source of inspiration for the oppressed people of the whole world forever. The article aims to analyze the background and major events of Language Movement and its impact on the social and political life of Bangladesh specially the War of Independence in 1971.

দু'হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার অধিকারী বাঙালী জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে চরমতম ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য ও নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকরা বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার এক ক্রুর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু বাঙালীর সময়োচিত ও সুদৃঢ় প্রতিরোধের ফলে এ নীল নকশা ব্যর্থ হয়। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগ ও সাফল্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রদর্শক, নিত্য দিনের চলার পথের প্রেরণা।

---

* প্রশিক্ষণার্থী, পঞ্চবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বিপিএটিসি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা ভাষার মর্যাদা

প্রাচীন যুগে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পায়নি। অনার্যদের পরাজিত করে বাংলা দখল করতে আর্যদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত আর্যদের বিভিন্ন পুস্তকে বাঙালীদের পক্ষী, রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। কেউ বাংলা ভাষার চর্চা করলে তাঁর স্থান পরকালে রৌরব নামক নরকে হবে বলে সংস্কৃতজ্ঞ ধর্মগুরুদের অনেকে ভীতি প্রদর্শন করতেন সাধারণ বাঙালীদের। কোন সাহসী আর্য যুবক বাংলায় প্রবেশ করলে আর্যাবর্তে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তার কপালে কলংক চিহ্ন এঁকে দেয়া হতো। প্রাচীন বাংলার শাসকদের মধ্যে একমাত্র শশাংক ব্যতীত অন্য কারো বাঙালীত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার উপায় নেই। গুপ্ত এবং পাল শাসকেরা বাঙালী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে আগত সেন শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। সংস্কৃত ছিলো রাজভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত। আপামর জনগণের ভাষা বাংলা ছিলো অবহেলিত। সমাজের উচ্চশ্রেণী বাংলা ভাষার প্রতি ছিলো উন্নাসিক। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগে ব্রাত্যজনেরাই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয় (১২০১-১২০৪) এর মাধ্যমে বঙ্গদেশে মধ্যযুগের সূচনা হয়। রাজভাষা হিসেবে সংস্কৃতের স্থান দখল করে ফার্সী। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গদেশের অধীশ্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন। বাংলা ভাষার মরা গাঙ্গে এলো জোয়ার। এতদিনের অবহেলিত বাংলা ভাষার চর্চা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোশকতায় হতে থাকে ঋদ্ধ। পরবর্তীতে হোসেন শাহী বংশের শাসনামলে এ পৃষ্ঠপোষকতা থাকে অব্যাহত। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, আবদুল হাকিম, মালাধর বসুর হাতে রচিত হতে থাকে বিখ্যাত মঙ্গল কাব্যসহ অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্য কর্ম। সহজিয়া মতবাদ বাংলা সাহিত্যকে করে সমৃদ্ধতর, বাঙালীর জীবনে সমন্বয়বাদের সূচনা হয় এ সময়েই। তবে বাংলার প্রতি উন্নাসিকতা সমাজের একাংশের মধ্যে তখনো ছিলো সক্রিয়। মাতৃভাষা বিদ্বেষী এ শ্রেণীকে কটাক্ষ করে আবদুল হাকিম লিখলেন (আখতার, ১৯৮৫)ঃ

"যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।"

ফার্সী রাজভাষা হলে ও বাংলা ভাষার চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়নি। এ সময় বিশেষতঃ নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটা বিরাট অংশ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করেনি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয় এ সময়ে। প্রকৃতপক্ষে সুলতানী আমল ছিলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইল ফলকস্বরূপ। এর মূলে বাঙালী সাহিত্যিকদের পাশাপাশি এসব ভিন্নভাষী সুলতান ও তাঁদের অমাত্যদের অবদান অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ যুগ

১৭৫৭ সনে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ডি'রোজিওর নেতৃত্বে ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলন প্রথমদিকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দিলেও ধীরে ধীরে এর মধ্যে স্বজাতি এবং মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্বেষের প্রবণতা দেখা যায়। ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকে শুদ্ধভাবে বাংলা লিখেত পড়তে এমনকি বলতে পর্যন্ত পারতেন না। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজীর মোহে পড়ে বাংলাকে জেলে মজুরের ভাষা বলে অবজ্ঞা করেছিলেন। পরবর্তীকালের নব জাগরণ ক্ষেত্র বিশেষে কলকাতায় ও তার আশেপাশে সীমিত থাকলেও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এর অবদান অপরিসীম। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) বাংলা ভাষাকে আধুনিক রূপ দান করেন। সংস্কৃত প্রীতিতে আচ্ছন্ন পন্ডিতশ্রেণীর হাতে এজন্য বিদ্যাসাগরকে নিন্দিত এমনকি প্রাণনাশের প্রচেষ্টারও মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। ফলে শ্রীমন্ত নামক এক লাঠিয়ালকে বিদ্যাসাগরের প্রাণ রক্ষায় নিয়োজিত করা হয়েছিলো। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষার প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাশাপাশি বাংলা বিদ্বেষী ভুল ইংরেজী বলায় পারদর্শী বাবু শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সেবার দার্জিলিং এ গিয়েছিলুম। গিয়ে দু'টো জিনিস দেখলুম। হিমালয় পর্বত অচল অটল, বিস্তৃত। আর দেখলুম বিলেত ফেরত বাঙ্গালী, না জানে বাংলা না জানে ইংরেজী।" ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষও রোপণ করে যা কালক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়।

বাংলা না উর্দূ? মুঘল আমলে সেনানিবাসে জন্মলাভ করে উর্দু ভাষা। প্রধানত ভারতের যুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) এর কিছু অভিজাত ব্যক্তির ভাষা ছিলো উর্দু। ব্রিটিশের বিভেদনীতি এবং হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ঈর্ষা-বিদ্বেষের ফলে জন্ম নেয় দ্বি-জাতি তত্ত্ব। উইলিয়াম হান্টারের মুসলমান প্রীতির নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং এক শ্রেণীর হিন্দু লেখকের মুসলমান শাসকদের চরিত্র হনন সাম্প্রদায়িকতার বিষ বৃক্ষে জল সিঞ্চন করে। বাংলা ভাষাকে একদিকে আরবী-ফারসী অন্যদিকে সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা চলে। এ প্রসঙ্গে ডঃ শহীদুল্লাহ বলেন (আখতার, ১৯৮৫)ঃ "একদল চাচ্ছে বাংলাকে বলি দিতে আর একদল চাচ্ছে জবেহ করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।" ভারত ভাগের আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে সুপারিশ করেন যদিও উর্দু পাকিস্তানের কোন অংশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা নয়। এর জবাবে জ্ঞান তাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের দাবী জানান।

পাকিস্তান ও বাঙালীর স্বপ্ন ভঙ্গ

সাম্প্রদায়িক ও মধ্যযুগীয় মতবাদ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ইতিহাসের এক অস্বাভাবিক বাঁক গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্ম নেয় কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের অহমিকা, সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের হীনমন্যতা ও সর্বোপরি ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাময়িকভাবে হলেও পরস্পরের প্রতি হয়ে পড়ে বৈরী ভাবাপন্ন যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাঙালী মুসলমানগণ। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নেই শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতিকে দাবিয়ে রাখার নীল নকশা প্রণয়নে নিয়োজিত হয়।

যে কোন সভ্য জাতির জাতিসত্ত্বার প্রাণ নিহিত রয়েছে তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। বাঙালী জাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি জাতিকে আত্মবিস্মৃত, স্থবির

করে তার উপর ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণের প্রক্রিয়া চিরস্থায়ী করতে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন এর ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবালের অবদানে সমৃদ্ধ উর্দু ভাষাকে বাংলা ভাষার উপর চাপিয়ে দিয়ে বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বাঙালীদের নিবীর্য জাতিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র আটে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। নতুন রাষ্ট্রের মোহে আচ্ছন্ন বাঙালীরাও প্রথমদিকে খেজুরগাছ ও উটের মধ্যে নিজ শিকড় সন্ধানে ছিলো ব্যস্ত। কিন্তু ভ্রান্তি বিলাস কখনো চিরস্থায়ী হয় না। একটি গোটা জাতিকে চিরতরে নেশাগ্রস্ত করে রাখা যায় না। অবাস্তব ও মধ্যযুগীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের স্বরূপ বাঙালীদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। বাদামী পাঞ্জাবীরা যে শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, শোষণের প্রক্রিয়া যে বন্ধ হয়নি তা ধীরে ধীরে বাঙালীর মানসলোকে ধরা পড়তে লাগলো।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। প্রথম দিনেই পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব করেন। প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ নাকচ করে একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং এমনকি শ্রী দত্তের ধর্মীয় পরিচয়কে কটাক্ষ করে এর মধ্যে পাকিস্তান তথা মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, জাতীয় পরিষদের বাঙালী সদস্যদের কেউই তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পাশে দাঁড়াননি।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালেই প্রধানতঃ গণ আজাদী লীগ এবং তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জনমত গঠন চলতে থাকে। বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা-সমাবেশ এবং লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালীদের ভাষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস পায় উল্লিখিত দু'টি সংগঠন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব নাকচ হওয়া এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য বাঙালী জাতির জন্য ছিলো চরম অবমাননাকর। ফলে রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নের বাঙালীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর শ্রেণীর সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মানসিক বন্ধন ক্রমেই শিথিল হতে থাকে।

পাকিস্তান গণ পরিষদের বাংলা বিরোধী অবস্থান এবং মুসলিম লীগের বাংলা বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় ছাত্র, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভা আহ্বান করা হয়। কামরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভাষার সংগ্রামকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শামসুল আলমকে আহবায়ক করে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমুদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে দু'-দু'জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পরিষদ ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ঐদিন ঢাকা এবং পূর্ব বঙ্গের আরো কয়েকটি স্থানে পালিত হয় ধর্মঘট। ঢাকায় হাইকোর্টে এবং সচিবালয়ের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সচিবালয়ের সামনে পিকেটিংরত অবস্থায় অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেফতার বরণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী গোলাম মাহবুব।

১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক প্রতিনিধিদল পূর্ব বাংলার চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর সরকারী বাসভবন বর্ধমান ভবনে সাক্ষাৎ করেন। তুমুল বাক-বিতন্ডার পর নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে নাজিমুদ্দীন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য প্রস্তাব আনবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন। এ ছাড়া ভাষার দাবীতে আন্দোলনকারীগণ বিদেশীদের চর–এ উক্তিও প্রত্যাহার করা হয়। চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা কারাবন্দী ভাষা আন্দোলনকারী অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক প্রমুখকে দেখানোর পর তাঁরা চুক্তিটি অনুমোদন করেন।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশ বিভাগ পরবর্তী প্রথম ও শেষ বারের মত ঢাকায় আগমন করেন। তিনি ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঢাকার নাগরিকদের প্রদত্ত সংবর্ধনায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে বলে মন্তব্য করেন।

অথচ বর্তমান গুজরাটের কাথিওয়াড়ের অধিবাসী মিঃ জিন্নাহ্ নিজেও ভালোমাতো উর্দু বলতে পারতেন না। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর বিরোধিতাকারীদের তিনি রাষ্ট্রের শত্রু এবং বিদেশের চর বলেও অভিহিত করেন। মিঃ জিন্নাহর এ বক্তব্যে সভাস্থলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও মৃদু গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়, তবে তা ব্যাপক আকার ধারণ করেনি।

২৪শে মার্চ, সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মিঃ জিন্নাহর সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেও মিঃ জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর রেসকোর্সের ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করলে (বিচারপতি) হাবিবুর রহমান এবং আবদুল মতিনসহ উপস্থিত ছাত্রদের কয়েকজন তৎক্ষণাৎ "না" "না" বলে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের মধ্যে জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যান এবং রাষ্ট্রাভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত অপরিবর্তিত রাখেন। একই দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ সাহেব বলেন যে ১৫ই মার্চ খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে জোর করে চুক্তিতে সই নেয়া হয়েছে তাই তিনি এ চুক্তিকে স্বীকার করেন না। উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে জিন্নাহ সাহেব পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ মিঃ জিন্নাহর কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালে ঢাকায় আগমন করেন। তখন ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি লিয়াকত আলী খানের কাছে পেশ করে। ৬ই এপ্রিল নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

বাংলা বিরোধী চক্রান্ত ও আরবী হরফে বাংলা লেখা

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতি বিরোধী চক্রান্ত চলতেই থাকে। প্রচার করা হয় যে, বাংলা বর্ণমালা যথেষ্ট আধুনিক নয় ও হিন্দুস্থানী

বৈশিষ্ট্যের ধারক। তাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে আরবী হরফে বাংলা লেখার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদের মতে, পাকিস্তানের দু অংশের জনগণের বর্ণমালা অভিন্ন হলে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হবে। এ চক্রান্ত দানা বাধে ১৯৪৯সালে। ১৯৫০ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর আরবী হরফে বাংলা লেখার ২০টি কেন্দ্র স্থাপন করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায়। আরবী হরফে বাংলা বই ছাপার জন্য সরকার পুরো খরচ বহন করে। আবরী হরফে বাংলা বই ছাপানোর জন্য সরকারীভাবে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কবি গোলাম মোস্তফা এ উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আরবী হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে ১৯৫০ সালের ৪ঠা অক্টোবর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্ত চলতেই থাকে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু বাংলা বই আরবী হরফে ছাপা হলেও মহাকালের গর্ভে সেগুলো বুদ্বুদের মতোই হারিয়ে যায়। কালক্রমে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভাঁটা পড়ায় হরফ পরিবর্তনের এ উদ্যোগ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট ইসলামী নয়, একে ইসলামীকরণ করতে হবে– এ মর্মে সরকারী প্রচারণা চলতে থাকে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানদের সম্মিলিত অবদানে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা। অথচ এ সময় রবীন্দ্রনাথকে বর্জন ও নজরুলকে খন্ডিতভাবে গ্রহণ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। এরূপ সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার অংশ হিসেবে মুসলিম বাঙালীর কালচার বা পাকবাংলার কালচারের ধারণা প্রচারেরও অপপ্রয়াস চালানো হয়। বাংলা ভাষাকে অহেতুক আরবী, ফার্সী শব্দে ভারাক্রান্ত করে এর খোল-নলচে বদলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। খাঁটি পাকিস্তানী হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথকেও ত্যাগ করবো–এমন ধ্যান ধারণা প্রচার করা হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় (আজাদ, ১৯৮৮)।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পাক শাসকগোষ্ঠীর এ চক্রান্ত অচিরেই বুঝতে পারে। সাময়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত আবার উজ্জীবিত হয় বাঙালী চেতনায়, প্রতিরোধে শামিল হয় বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পাকিস্তানী কুটিল

চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নাম দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়। এর কার্যক্রম ক্রমে জোরদার হতে থাকে। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রধামন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়।

নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে ছাত্র সমাজ তথা জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয় ৩০শে জানুয়ারী। ৩১শে জানুয়ারী কাজী গোলাম মাহবুবের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে চল্লিশ সদস্যের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আহুত ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা এবং আরবী হরফে বাংলা লেখার অপপ্রয়াসেরও নিন্দা করা হয়।

১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ধর্মঘটের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। সেখানে কয়েক হাজার ছাত্রের সমাবেশে পল্টন ময়দানে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার নিন্দা জানিয়ে ১৯৪৮ সালের চুক্তি পালনের জন্য তাঁর প্রতি আহবান জানানো হয়। প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে এ মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেন (এডভোকেট) গাজীউল হক। সভাপতি হিসেবে গাজীউল হকের নাম প্রস্তাব করেন মুস্তাফা রওশন (এম আর) আখতার মুকুল আর সমর্থন করেন কামরুদ্দীন শহুদ। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রাদেশিক গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকেলের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহবান করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা থেকে আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভাষার দাবী চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে সরকার এবং আন্দোলনরত ছাত্র জনতা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারী কী ঘটবে এ নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে শংকা দেখা দেয়।

১৯৫২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী কারাগারে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহিউদ্দীন আহমদ ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘটন শুরু করেন। ঐদিনই তাঁদের ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। পথিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ষ্টিমার ঘাটে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায়ই শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। এ সময় জনাব মহিউদ্দিনের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিলো (সারওয়ার, ২০০০)।

২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫টায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে নবাবপুরে অবস্থিত আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনই বিকাল ৩টার দিকে ঢাকা শহরে ত্রিশ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা না করা নিয়ে সভায় উত্তপ্ত আলোচনা হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সমর্থক তরুণ ছাত্রনেতা হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরোধিতাকারী আওয়ামী লীগ সম্পাদক শামসুল হকের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। অলি আহাদ এবং আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন। অবশেষে বিষয়টি ভোটে দেয়া হয়। ভোটাভুটিতে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একজন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন এবং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গভীর রাতে (আখতার, ১৯৮৫)। সন্ধায় ফজলুল হক মুসলিম হল এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে যথাক্রমে আবদুল মোমিন এবং ফকির শাহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে জানিয়ে দেয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কিনা তা ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই চূড়ান্ত করা হবে।

ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী

বায়ান্নের ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমবেত হতে শুরু করে। সব ছাত্রছাত্রীর গন্তব্য একটাই- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। পুলিশে দেখে ছাত্রদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সকাল দশটায় আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্রদের সমাবেশ শুরু হয়। একটি টেবিলের উপর দাড়িয়ে গাজীউল হক এ মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে বিপক্ষে বক্তব্য রাখা হয়। অবশেষে সভাপতি তার ভাষণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ছাত্র ছাত্রীরা এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং উত্তেজিত হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে শ্লোগন দিতে থাকে। সিদ্ধান্ত হয় দশ জন করে মিছিল নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। সে অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে প্রথম দলটি এগিয়ে যায় মিছিল নিয়ে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাদের গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলে। এ রকম বেশ কয়েকটি দশজনের মিছিল গ্রেফতার বরণ করে। মেয়েদের প্রথম দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাফিয়া খাতুন। পুলিশ এ দলটিকেও গ্রেফতার করে। ইতোমধ্যে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এক পর্যায়ে একটি টিয়ার গ্যাসের সেল সরাসরি গাজীউল হকের বুকে আঘাত করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁকে ধরাধরি করে মেয়েদের কমনরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি চালায়। বাঙালীর রক্তে সেদিন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলো। পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হলেন (উমর, ১৯৯৩)।

ভাষার দাবীতে প্রাণ বিসর্জন বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম। ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহবান করায় সকাল থেকেই বহু দোকানপাট বন্ধ থাকে এবং যানবাহন চলাচলও কম ছিলো। কিন্তু ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদে দোকানপাট এবং যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তিন শহীদের লাশ আত্মীয় স্বজনের কাছে হস্তান্তর না করে পুলিশি তত্ত্বাবধানে ঐদিনই রাতে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়। সেদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দুজন ছাত্র পুলিশের পিছু নিয়ে গোপনে শহীদদের কবরগুলো দেখে চিহ্নিত করে আসেন (আখতার, ১৯৮৫)।

গুলির্ষণের পর ছাত্ররা ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) সামনে গিয়ে চিৎকার করে সদস্যদের বেরিয়ে আসতে বলে। মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ, মনোরঞ্জন ধর ও বীরেন্দ্রনাথ দত্ত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার দাবী জানান যাতে সদস্যগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং হাসপাতালে গিয়ে হতাহতদের দেখে আসতে পারেন। তাঁরা এ বিষয়ে চীফ মিনিস্টার নূরুল আমিনের বিবৃতিও দাবী করেন। নুরুল আমিন এতে সম্মত হননি। পুলিশী নির্যাতন ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। মেডিক্যাল হোস্টেলের একটি কক্ষে মাইক বসিয়ে ছাত্ররা আগে থেকেই বক্তৃতা করছিল। তর্কবাগীশ হোস্টেলে গিয়ে সেই মাইকে ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ হাজার লোক এতে অংশ নেয়। মাওলানা ভাসানীর এতে ইমামতি করার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। অনুরূপ চেহারার এক শ্মশ্রুমন্ডিত বৃদ্ধ সেদিন জানাজায় ইমামতি ও জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন (আখতার, ১৯৮৫)। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণ এ মিছিল হাইকোর্টের সামনে পৌছালে পুলিশ মিছিলের মাঝামাঝি জায়গায় লাঠিচার্জ করে। মিছিলটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একাংশ স্কুলের সামনে পুনরায় লাঠিচার্জের ফলে ছাত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে। অপর অংশ নবাবপুর মোড়ে পৌছালে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে একটি বালকসহ কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হন। এদিন নবাবপুরে মরণ চাঁদের মিষ্টির দোকানের সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান। ভাষা আন্দোলনকে কটাক্ষ করে সংবাদ পরিবেশন করায় জনতা সেদিন মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়। মুসলিম লীগের মালিকানাধীন সংবাদ পত্রিকার অফিসও আক্রমণ করে জনতা। ২১ এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী কমপক্ষে ৮জন পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন (উমর, ১৯৯৩)। এদের অন্যতম এমএ ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত, সালাহউদ্দিন, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউর রহমান প্রমুখ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে শহীদের স্মরণে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার। অচিরেই এটা পুলিশ কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এদিকে মুসলিম লীগ সরকারও নিষ্ক্রিয় ছিল না। তাঁরা তাঁদের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে বিদেশী চরদের কারসাজি হিসেবে বিরামহীন প্রচার করতে থাকে। মুসলিম লীগের মুখপত্র আজাদ পত্রিকা প্রথমদিকে আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে এর সুর বদলে যেতে থাকে। এদিন আজাদ পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনকে বেআইনীভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারী হিন্দুদের কারসাজী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১লা মার্চ নারায়ণগঞ্জে জনৈক পুলিশ কনস্টেবল গুপ্তহত্যার শিকার হন। সরকার এ হত্যাকান্ডকে কমিউনিষ্ট ও বিদেশী চরদের কর্ম বলে অভিহিত করে এবং নিহতের পরিবারকে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পাশাপাশি চলতে থাকে ধরপাকড়। ৫ই মার্চ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সর্বদলীয়ভাবে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ঢাকায় ব্যর্থ হলেও সারা পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। এতদসত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার নির্যাতন কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। এ অবস্থায় মার্চের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ আন্দোলনে সাময়িক ভাটা পড়ে। তবে জনতার ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি।

মহান ভাষা আন্দোলনের ফলাফল

মহান ভাষা আন্দোলনের ফলাফল ছিলো সুদুরপ্রসারী। এর ফলে বাঙালীর জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত চিন্তধারায় পরিবর্তনে সূচনা হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মায়াজালে বাঙালীরা যে তথাকথিত ধর্মাশ্রিত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের মোহে আবিষ্ট হয়েছিলো তা ফিকে হয়ে আসতে থাকে ভাষা আন্দোলনের ফলে। বাঙালী সত্ত্বার বিকাশের সূচনা হল। ইরান, তুরান, আরব ভূমির পরিবর্তে বাঙালী নিজ ভূমিতে পেলো আপনার উৎসের সন্ধান। ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের যাত্রা শুরু হলো, এ জাতীয়তাবোদেই বাঙালী জাতিকে ৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। ভাষা আন্দোলন ছাড়া তা সম্ভব হতো না। তাই বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনকে অভিহিত করেছেন বাঙালী মুসলমানের নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন হিসেবে (উমর, ১৯৯৩)। ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদই মহান ভাষা আন্দোলনের মহত্তম অর্জন।

ভাষা আন্দোলনের অনিবার্য ফল হিবে পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগ প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে ২১শ ফেব্রুয়ারী স্মরণে ২১ দফা কর্মসূচি নিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লীগ ধরাশায়ী হয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন সহ সকল মন্ত্রী নির্বাচনে পরাজিত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী জাতির অগ্রসর শ্রেণীর মনে এ বোধ জাগ্রত হয় যে পাকিস্তানী শাসনে বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর হাজার বছরের সংস্কৃতি নিরাপদ নয়। চাপিয়ে দেয়া উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে পিষ্ট করা যে পাকিস্তানী শাসকদের অভিপ্রায় ছিলো এটা বুঝতে দেশপ্রেমিক বাঙালীদের অসুবিধা হলো না। ফলে বাঙালী জাতি আপন ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা ও স্বকীয়তা রক্ষায় হলো দৃঢ় সংকল্প। এ দৃঢ়তা ও সচেতনতা প্রাগ্রসর শ্রেণী থেকে ক্রমশ সাধারণ বাঙালীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। অন্যদিকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালীকে সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চালাতে থাকে নানামুখী আক্রমণ। কিন্তু একুশের তথা ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী জাতি এ সব আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয় অপরিসীম দৃঢ়তার সঙ্গে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালনে সরকারী বাধা উপেক্ষা করে বাঙালী জাতি পাকিস্তানী শাসকদের চক্রান্তের উপযুক্ত জবাব দেয়। মহান ভাষা আন্দোলনে এক্ষেত্রে জুগিয়েছে প্রেরণা। পাকিস্তানবাদী চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বাঙালী জাতির বিচ্ছিন্নতার সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই। এ বিচ্ছিন্নতা প্রথমদিকে সমাজের উপর তলার এবং তরুণ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশ তা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করে। এ বিচ্ছিন্নতাবোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে।

পাকিস্তানী আমলের প্রথম দিকে রচিত বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই নবলব্ধ রাষ্ট্রের বন্দনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ভাষা আন্দোলনের পর এ ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সূচিত হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হতে থাকে অসংখ্য গল্প,

কবিতা, উপন্যাস, গান। এসব সাহিত্য কর্মের কোন কোনটিতে আবেগের আতিশয্য থাকলেও এদের অনেকগুলোই বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়।

হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি ছিলো ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহজিয়া মতবাদ প্রভাবিত। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানদের সম্মিলিত অবদানে এ সংস্কৃতি হয়েছে পরিপুষ্ট। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনার ফলে বিংশ শতব্দীর প্রথমদিকে বাংলার সংস্কৃতিক জীবনে এ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক জগত সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদে হয় কলুষিত। বাঙালী সংস্কৃতির মিলনাত্মক বৈশিষ্ট্য হয় ক্ষুন্ন। এ ভূখন্ডের অধিবাসীগণ বাঙালীর পরিবর্তে হিন্দু, মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হলো। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এলো এক অদ্ভুত আঁধার ও বন্ধ্যাত্ব। এ অন্ধকার যুগ পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। মহান ভাষা আন্দোলনের ফলে এ অন্ধকার যুগের অবসানের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এলো এক নতুন জোয়ার। বাঙালী জাতি পুনরুদ্ধার করলো তার হারিয়ে যাওয়া বাঙালী সত্ত্বাকে যা এতদিন ধর্মীয় পরিচয়ের আড়ালে চাপা পড়েছিলো। মহান ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় সঞ্জিবিত বাঙালী ঢাকাকে কেন্দ্র করে আপন জাতি সত্ত্বা বিকাশে নিয়োজিত হলো।

বর্তমানে একথা অনস্বীকার্য যে ঢাকা কেন্দ্রীক বাংলা সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের মূলধারা। কারণ ভারতের বহু ভাষার মধ্যে বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা অন্যদিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, ঢাকাই এক সময় বাংলা সাহিত্যের রাজধানীতে পরিণত হবে। আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে নিয়ে পরবর্তীকালে প্রধামন্ত্রীর সরকারী বাসভবনবর্ধমান ভবনকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমীতে পরিণত করা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে বাংলা একাডেমীর অবদান অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন বাঙালীদের প্রথম সংঘটিত আন্দোলন। বাঙালী জাতির পরবর্তী সকল আন্দোলনে ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণা দান করে।

ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত এ ভূখন্ডের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের আসাম রাজ্যে অসমিয়া ভাষার সঙ্গে বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা করার দাবী উপেক্ষিত হলে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলী চালালে শচীনপাল, সুনীল, মাধুরীসহ আটজন বাংলা ভাষাভাষী প্রাণ বিসর্জন দেন। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন যে তাদের এ চরমতম আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিলো এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উপসংহার

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ মহান ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চরমতম প্রকাশ একুশে ফেব্রুয়ারী তাই প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙালীর আত্মার আত্মীয়। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা শুধু নয় মাসের যুদ্ধের ফসল নয়। আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯ এর রক্তাক্ত সোপান পেরিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চরম পরিণতি লাভ করে। ২৪ বছরের পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভাষা আন্দোলন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন বিশেষ করে ২১শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির ক্রোধের বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। সেদিন যদি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বাঙালীদের উপর উর্দু চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতো তবে আজ আমরা কি অবস্থায় দিন যাপন করতাম তা ভাবাও দুঃস্বপ্নের মতো।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনের ছাত্র-যুব নেতাদের অধিকাংশই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি যুদ্ধে মুখ্য কুশীলবের ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই দেশের অগ্রসর শ্রেণীর মন থেকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের কালো পর্দা সরে যেতে থাকে। দেড় দশকের মধ্যেই দ্বি-জাতি তত্ত্ব তথা পাকিস্তানবাদী চেতনা থেকে বিকাশমান মধ্য শ্রেণী নিজেদের বিযুক্ত করতে সক্ষম হয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখা হলে মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব উক্ত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী পাকিস্তানকে 'ওলায়কুম আচ্ছালাম' জানান। এক যুগ পর

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেন এখন থেকে এ ভূখন্ডের নাম বাংলা- বাংলাদেশ। ডঃ আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী অধিকাংশ ছাত্র যুবকই কৃষক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই পরবর্তীতে বিকশিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে (রহমান ও হাশেমী, ১৯৯১)।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমাদের সমাজে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার নামে এক ধরনের কূপমন্ডূকতা আবির্ভূত হয়েছে। মহান ভাষা আন্দোলন কোন বিশেষ ভাষার বিরুদ্ধে ছিলনা এটা ছিলো সংখ্যাগুরুর ভাষাকে পাশ কাটিয়ে সংখ্যালঘুর ভাষা চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। একথা স্বীকার করতে হবে আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের সিংহদুয়ার হলো ইংরেজী ভাষা। তাই বিশ্বায়নের এ যুগে সম্মানের মাঝে টিকে থাকতে হলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষাও শিখতে হবে। কিন্তু মাতৃভাষাকে কোনক্রমেই অবহেলা করা যাবে না। কারণ মাতৃভাষার জ্ঞান ভিন্ন কোন জ্ঞানই পূর্ণতা পায়না।

সম্প্রতি কানাডা প্রবাসী বাঙালীদ্বয় সালাম ও রফিকের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের ত্বড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এ স্বীকৃতি বাঙালী জাতিকে করেছে গৌরবান্বিত। এটা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের চরমতম আত্মত্যাগের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি। এখন থেকে জাতিসংঘের বাকী ১৮৮টি সদস্য দেশেও পালিত হবে ২১শে ফেব্রুয়ারী,গীত হবে অমর ভাষা শহীদের বীরত্ব গাঁথা। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের বিষয়। অভাব, অজ্ঞতা, ক্ষুধার দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ আরেকটি পরিচয়ে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হলো আর তা হলো ভাষা শহীদের দেশ। ভাষা আন্দোলন' ২১ ফেব্রুয়ারী এবং শহীদ মিনার আমাদের সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল ধর্মের বাঙালীর মিলন মেলা আমাদের শহীদ মিনার। শহীদ মিনার সকল ধরনের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ। তাই আমাদের সকল সংগ্রামের সূচনা হয় শহীদ মিনারেই। যতদিন বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষা

বিশ্বের বুকে টিকে থাকবে ততদিন ভাষা আন্দোলন, ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং শহীদ মিনার স্বমহিমায় থাকবে সমুজ্জ্বল।

তথ্য নির্দেশিকা

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৮৮) *সাপ্তাহিক নিপুণ, ঈদ সংখ্যা।* ঢাকা।

আহ্‌মদ কামরুদ্দীন (১৯৭৬) *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও রাজনীতি।* ঢাকা ঃ ইনসাইড লাইব্রেরী।

আহমদ ফয়েজ (১৯৮৭) *মধ্যরাতের অশ্বারোহী।* ঢাকা ঃ সন্ধানী প্রকাশনী।

ইসলাম সিরাজুল (১৯৯৫) *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)।* ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম সাইফুল (১৯৮৭) *স্বাধীনতা, ভাসানী, ভারত।* ঢাকা ঃ অয়ন প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৫) *ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৩) ভাষা আন্দোলন। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯৪) *পূর্ব পশ্চিম।* কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৬) *দুই বাঙালীর লাহোর যাত্রা।* ঢাকা ঃ আফসার ব্রাদার্স।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৪) *বাঙালীর জয় পরাজয়।* ঢাকা ঃ বিদ্যাপ্রকাশ।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৩) *দ্বি-জাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা।* ঢাকাঃ বিদ্যাপ্রকাশ।

মুকুল, এম আর আখতার (১৯৮৫) *বাহান্নর জবানবন্দী।* ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স।

রহমান, আতিউর ও সৈয়দ হাশেমী (১৯৯১) *ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান।* ঢাকা ঃ গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

সারওয়ার, মুস্তাফা (২০০০) *টিভি সাক্ষাৎকার,* ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

হোসেন, সেলিনা (১৯৮৯) *নিরন্তর ঘন্টা ধ্বনি।* ঢাকা ঃ মুক্তধারা।

হোসেন, সেলিনা (১৯৯৩) *গায়ত্রী সন্ধ্যা,* ঢাকা ঃ মুক্তধারা।

Wali, Khan Abdul (1988) *Facts of Facts*. Dhaka: UPL.